দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য ও হিংসা-মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন কি স্বপ্নই থেকে যাবে?

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক, রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা

পৃথিবীর সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক মঞ্চ রাষ্ট্রপুঞ্জের সুবর্ণজয়ন্তী বা ৫০তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালের ২৪ অক্টোবর আমেরিকার নিউ ইয়র্ক শহরে। তিনদিনব্যাপী (২২-২৪ অক্টোবর ১৯৯৫) এই উৎসব-নুষ্ঠানে পৃথিবীর ১৮৫টি দেশের শীর্ষনেতৃবৃন্দ অংশগ্রহণ করে একে প্রকৃতপক্ষেই একটি বিশ্বজনীন আকার দান করেন। ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা প্রতিশ্রুতিপূর্ণ ঘটনা -রাষ্ট্রপুঞ্জের জন্ম হয়েছিল আমেরিকার সান ফ্রান্সিসকো শহরে। শতাব্দীর সর্বাপেক্ষা কলঙ্কিত অধ্যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তি হয়েছিল ঐ বছরের ২ সেপ্টেম্বর জাপানের নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের মাধ্যমে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে। এত বিশাল ধ্বংস ও জীবনহানি পৃথিবীর ইতিহাসে সেই প্রথম। এই যুদ্ধে এক কোটি মানুষের জীবনের আলো নিভে গিয়েছিল , আহতের সংখ্যাও ছিল বিরাট। যুদ্ধ-সমাপ্তির পূর্বে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে আণবিক বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। প্রলয়ঙ্কর এই মারণাস্ত্র নিক্ষেপের পরিণতি দেখে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে গোটা বিশ্ব। এই মহাবিধ্বংসী যুদ্ধের পর পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির প্রশণ ও প্রয়াসকে সুরক্ষিত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন বিজয়ী শক্তিগুলিও। পৃথিবীর ৫০টি রাষ্ট্র সম্মিলিত হয়ে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইউনাইটেড নেশন্স' বা 'রাষ্ট্রপুঞ্জ'। বর্তমানে এই বিশ্বসংগঠনটির সদস্যসংখ্যা প্রায় দুশো। গত শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ১৯১৪ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল শতাব্দীর প্রথম দুর্দৈব -প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। প্রায় পাঁচবছর পর ১৯১৮ সালের শেষে (১১ নভেম্বর) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়। ইউরোপের দেশগুলির মধ্যে সঙ্কীর্ণ স্বার্থজড়িত মনোমালিন্যের সূত্রে যে -যুদ্ধের শুরু, ক্রমে তা বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল সারা বিশ্বে। লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণহানি এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংসের পর যখন এই যুদ্ধ শেষ হলো , তখন বিশ্বনেতৃবর্গ আবিষ্কার করলেন , এমন একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ও অনুশাসনাবলী গঠন করা প্রয়োজন, যা আগামী দিনে পৃথিবীতে এমন ভয়াবহ যুদ্ধের আত্মপ্রকাশের সম্ভাবনাকে নির্মূল করবে। সেই আবিষ্কারের সূত্র ধরেই ১৯১৯ সালে সংগঠিত হয়েছিল 'লীগ অফ নেশন্স'। শান্তিস্থাপনের প্রয়াসে গঠিত 'লীগ অফ নেশন্স' কার্যত ব্যর্থ হয়েছিল। কারণ, ক্ষমতালোভী, যুদ্ধবাজ রাষ্ট্রপ্রধানগণ তলে তলে অস্ত্রে শান দিয়েই চলছিলেন। তারই ফলে অধিকতর ভয়ঙ্করভাবে একদিন আত্মপ্রকাশ করল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। বাংলার এক অখ্যাত পল্লী জয়রামবাটীতে বসে শ্রীমা সারদাদেবী সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন, 'লীগ অফ নেশন্স'-এর অঙ্গীকারপত্র বিশ্বনেতৃবৃন্দের মুখের কথা মাত্র, অন্তরের ভাষা নয়। বিশ্বের রাষ্ট্রনায়কগণের এই নির্লজ্জ দ্বিচারিতা এবং স্ববিরোধিতায় চূড়ান্ত হতাশ হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই চরম হতাশাই ব্যক্ত হয়েছিল তাঁর লেখনীমুখে :

"নাগিনীরা দিকে দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস।" ('প্রান্তিক')

দুর্ভাগ্যবশত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পৃথিবীকে অসাম্য ও যুদ্ধ -মুক্ত করার প্রয়াসে যে -রাষ্ট্রপুঞ্জ সংগঠিত হয়েছিল, সেই রাষ্ট্রপুঞ্জও তার লক্ষ্যে শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। রাষ্ট্রপুঞ্জের সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশনে তার মহাসচিবও সেকথা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন। রাষ্ট্রপুঞ্জের সাফল্যের তুলনায় ব্যর্থতার তালিকাই বিরাট এবং ব্যর্থতার কারণ এতটাই সুস্পষ্ট যে, তা অনুসন্ধান করার জন্য মোটেই গভীরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সেই কারণ হলো -পৃথিবীর এই সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক

প্রতিষ্ঠানটি, যার পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও প্রভাবশালী সংগঠন হিসাবে পৃথিবীর সমস্ত রাজনৈতিক , সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলির নিয়ন্ত্রণ ও নিরসন করার কথা ছিল , একটি নখদন্তহীন কাগজী বাঘে পরিণত হয়েছে এবং তার ভূমিকাকে ক্রমশই আন্তর্জাতিক আর্থ –সামাজিক–সাংস্কৃ ব্যবস্থায় সম্পূর্ণরূপে গুরুত্বহীন করে দেওয়ার উদ্যোগ ও প্রয়াস শুরু হয়েছে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কেউ কেউ রাষ্ট্রপুঞ্জ ব্যাপারটিকেই এক বিরাট তামাসা বলে অভিহিত করছেন। তবে এটা ঘটনা যে, রাষ্ট্রপুঞ্জ আজ বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলির (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া এবং চীন) নিছক ক্রীড়নকে পরিণত। এই শক্তিগুলি যা খুশি করছে , পদে পদে রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষিত নীতিগুলি লন্দ্রন করছে এবং রাষ্ট্রপুঞ্জের মর্যাদাকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নিজেদের আত্মম্ভরিতা প্রকাশ করে চলেছে। সুবর্ণজয়ন্তী উৎসবে বৃহৎ শক্তিবর্গের পক্ষ থেকে যে –বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে তাকে আত্মম্ভরী মুরুব্বিয়ানা ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। যেন তারা , বিশেষত আমেরিকা, গোটা পৃথিবীর স্বঘোষিত অভিভাবকত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত আনন্দের বিষয় যে, ভারত–সহ কয়েকটি রাষ্ট্র বৃহৎ শক্তিবর্গের এই মুরুব্বিয়ানার বিরুদ্ধে তর্জনী তুলেছে। বস্তুত, এই মৌরসিপাট্টার অবসান না ঘটলে রাষ্ট্রপুঞ্জের পক্ষে আন্তর্জাতিক দ্বন্দ্ব ও সন্দ্রাত নিরসনের ক্ষেত্রে আগামী পঞ্চাশ বছরেও কোন অর্থবহ ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শতবর্ষ পূর্বে বৃহৎ শক্তিগুলির এই মুরুব্বিয়ানা ও মাতব্বরির বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ ভাষায় সরব হয়েছিলেন তরুণ ভারতীয় সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ। আমেরিকার মাটিতে দাঁড়িয়ে শিকাগোর আন্তর্জাতিক মঞ্চভূমিতে পরাধীন, দরিদ্র ও উপেক্ষিত ভারতবর্ষের প্রতিনিধি স্বামী বিবেকানন্দ দেখিয়েছিলেন , ঐ ব্যাধি যেন তাদের উত্তরাধিকার। তাদের সেই নগ্ণ আত্মম্ভরিতার মুখোশ খুলে দিয়েছিলেন স্বামীজী। তিনি বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছিলেন : "আমরা যাঁরা প্রাচ্য দেশ থেকে এসেছি, এখানে বসে দিনের পর দিন মাতব্বরী ভাষায় শুনছি যে, আমাদের খ্রীস্টধর্ম গ্রহণ করা উচিত, কেননা খ্রীস্টান জাতিসমূহ সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধশালী। আমাদের চারপাশে তাকিয়ে আমরা দেখতে পাই যে , পৃথিবীতে খ্রীস্টান দেশসমূহের মধ্যে ইংল্যান্ড পঁচিশ কোটি এশিয়াবাসীর গলায় পা দিয়ে বিত্তবৈভব লাভ করেছে। ইতিহাসের পৃষ্ঠা উলটে আমরা দেখি , খ্রীস্টান–ইউরোপের সমৃদ্ধি শুরু হয় স্পেনে , আর স্পেনের ঐশ্বর্যলাভ মেক্সিকো আক্রমণের পর থেকে। খ্রীস্টানরা সম্পদশালী হয় মনুষ্যভ্রাতাদের গলা কেটে। এই মূল্যে আমরা সম্পদশালী হতে চাই না। " উনবিংশ শতাব্দীর শেষে আন্তর্জাতিক ধর্মীয় মঞ্চে পাশ্চাত্যের প্রতিনিধিগণ যে –মুরুব্বিয়ানা দেখিয়ে চলছিলেন , আজ পাশ্চাত্য তথা বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্ণধারগণ আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রনৈতিক মঞ্চে তারই পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন। সময় অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু তাঁদের মানসিকতার কোন পরিবর্তন হয়নি।

ধর্মমহাসভায় যেমন ভারতবর্ষ থেকে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রাধান্য –প্রতিষ্ঠার মানসিকতা ও প্রকাশ্য প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ উঠেছিল, এবারেও ভারত থেকে ঐ মানসিকতা ও প্রকাশ্য প্রয়াসের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। নিউ ইয়র্কে ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ সভায় সুবর্ণজয়ন্তী অধিবেশনে তৎকালীন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রণব মুখার্জির বলিষ্ঠ ভাষণের কথা এখানে স্মরণ করছি। ২৪ অক্টোবর সুবর্ণজয়ন্তীর মূল অনুষ্ঠানে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পি ভি নরসিমা রাও ভারতের বক্তব্য ও অভিমতকে তীব্রতর করেছেন। সাম্প্রতিক কালে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ এবং নরেন্দ্র মোদীও স্পষ্ট ও বলিষ্ঠভাবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির সদর্থক ভুমিকা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেছেন রাষ্ট্রপুঞ্জের সভায়। মনে হয় , অন্যায় ও শোষণের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষ যেন শুধু প্রতিবাদীর কণ্ঠ তোলার জন্যই নয় , বিশ্বের বিবেকের ভূমিকা গ্রহণ করার জন্যও বিধাতা–নির্দিষ্ট।

পৃথিবীতে যুদ্ধমুক্ত পরিবেশ প্রদানের যে –ঙ্গীকার রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদে গৃহীত হয়েছিল , শক্তি, সামর্থ্য ও সমৃদ্ধির নিরিখে তাকে বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব কিন্তু বৃহৎ শক্তিবর্গেরই। কিন্তু সেই প্রাসঙ্গিক দায়বদ্ধতা থেকে বাস্তবে বারবার তারা সদম্ভে সরে গিয়েছে। সাম্প্রতিক কালে আমরা দেখেছি , রাষ্ট্রপুঞ্জ এক্ষেত্রে অকর্মণ্য ঠুঁটো জগন্নাথের ভূমিকা পালন করে চলছে। একদিকে প্রতি ঘণ্ঢায় পরমাণু অস্ত্র নির্মাণ করতে একটি রাষ্ট্রের কমপক্ষে ২৫০ কোটি টাকা বা ততোধিক খরচ হচ্ছে , অন্যদিকে তৃতীয় বিশ্বে প্রতি ঘণ্ঢায় কোটি কোটি মানুষ অনাহারে মরছে, অশিক্ষায় ডুবছে, দারিদ্র্যে জর্জরিত হচ্ছে। আফ্রিকায়

প্রতি ঘণ্টায় প্রতি তিনটি শিশুর মধ্যে দুটি শিশু অপুষ্টিতে ভুগে মৃত্যুর কোলে ঢ়লে পড়ছে। এই অবস্থা সভ্যতার লজ্জা , মনুষ্যত্বের লজ্জা। এ চলতে পারে না , একে চলতে দেওয়া চলতে পারে না। জাতিদাঙ্গা , দারিদ্র্য, সন্ত্রাস ও বর্ণবৈষম্য কেন আজও দুরারোগ্য ব্যাধির মতো পৃথিবীকে জর্জরিত করবে ? বসনিয়া, রোয়ান্ডা, সোমালিয়া, কাশ্মীর, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্থান, সিরিয়া, লেবানন, ইজরায়েল, প্যালেস্টাইন, আমেরিকার ডালাসের ঘটনার পর কেমন করে বৃহৎ শক্তিবর্গ নিজেদের সভ্য বলে দাবি করতে পারে? এক্ষেত্রে রাষ্ট্রপুঞ্জের ব্যর্থতা বড়ই প্রকট হয়ে উঠেছে। মানবপ্রগতির আশা ও আকান্দাকে কর্মে পরিণত করার ভূমিকা গ্রহণের কথা ছিল যে –বিশ্ব–প্রতিষ্ঠানট্, যার কাছে পৃথিবীর প্রত্যাশা ছিল মানবপ্রগতির প্রহরী ও প্রতীক হয়ে ওঠার–তার এই শোচনীয় ব্যর্থতা কোন্ ভবিতব্যের ইঙ্গিতবহ ? তবে কি মানবপ্রগতির সম্ভাবনা রাহুগ্রস্ত ? দারিদ্র্য, সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য ও হিংসা–মুক্ত পৃথিবীর স্বপ্ন কি শুধু স্বপ্নই থেকে যাবে? বিশ্বের বৃহৎ রাষ্ট্রগুলির নেতৃবৃন্দ কি 'মতুয়ার বুদ্ধি'তেই মশগুল হয়ে থাকবেন? 'মতুয়ার বুদ্ধি' যে শুধু নিজেরই অনর্থ ডেকে আনে না , সকলের সমূহ বিনষ্টিকেই ত্বরান্বিত করে–একথা ঐ উন্নাসিক নেতৃবর্গ কবে বুঝবেন ? রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ বছরেরও অধিক অতিক্রান্ত হয়ে গেল। ক্রমশ পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সাফল্যের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে পারস্পরিক অবিশ্বাস, দ্বন্দ্ব, অসহিষ্ণুতা ও অসহযোগিতার মনোভাব ও কর্মধারা ক্রমবর্ধমান। কোথাও যুযুধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বারুদের গন্ধ মেলাতে না মেলাতে অন্যত্র আবার বারুদের গন্ধ আকাশ –বাতাসকে ভারি করে তুলছে। সাম্প্রতিক কালে চিন ক্রমাগত পাকিস্তানকে ভারতের বিরুদ্ধে প্রবল সমর্থন দিয়ে চলেছে। দক্ষিণ চিন সাগরে অন্যায়ভাবে চিন তার আগ্রাসন সদম্ভে প্রকাশ করে চলেছে। আন্তর্জাতিক আদালতের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে যাচ্ছে। এ কোন্ ধরণের উন্নাসিকতা অথবা অহমিকা ? এমন মানসিকতা শান্তির পক্ষে প্রবল অন্তরায়।

এই হতাশার মধ্যে, এই অন্ধকারের মধ্যে, এই আশঙ্কার মধ্যে ভারত কিন্তু তার সনাতন ভূমিকা থেকে সরে আসেনি। দারিদ্র্য, সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য ও হিংসার বাতাবরণ ভারতেও এই মুহূর্তে প্রকট , কিন্তু ভারত একথাই বিশ্বমঞ্চে বলিষ্ঠ ভাষায় ঘোষণা করেছে যে , পৃথিবীর একটি প্রান্তেও যদি এই বাতাবরণ বিদ্যমান থাকে এবং অবশিষ্ট পৃথিবী যদি তা থেকে মুক্ত থাকে, তাহলে কখনোই পৃথিবীতে শান্তি , কল্যাণ, মৈত্রী, সৌহার্দ্য ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে না। চাই সমগ্র পৃথিবীকে সম্পূর্ণভাবে সমৃদ্ধ করার অঙ্গীকার ও প্রয়াস। রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসবাদ , পরমাণু অস্ত্রনির্মাণ–প্রয়াস ও অস্ত্র–প্রতিযোগিতাকে যেকোনভাবে নির্মূল করা প্রয়োজন। কারণ , এগুলি প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধেরই রকমফের। ভারতের এই উচ্চারণে বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র উদ্দীপ্ত হয়েছে এবং ভারতকে হার্দিক অভিনন্দন জানিয়েছে। বলা বাহুল্য , এই উপলব্ধিই মানবপ্রগতিকে সুরক্ষিত করতে পারে, রাষ্ট্রপুঞ্জকে অর্থবহ করতে পারে, তার ভূমিকাকে কার্যকরী করতে পারে।

বর্তমান ভারতের এই উচ্চারণের পিছনে রয়েছে তার সুদীর্ঘ আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহ। বৈদিক ঋষিরা বিশ্বকে একটি 'নীড়'–এ পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছেন জল–স্থল–ন্তরিক্ষে, মানুষ–পশু–পাখি–পত্, বৃক্ষ–লতা–গুল্ম–ওষ শান্তির জন্য প্রার্থনা করেছেন। পুরাণকারগণ প্রার্থনা করেছেন নিখিল মানবের সুখ ও নিরাময়ের। পৃথিবীর কেউ যেন কোথাও অপ্রিয় কিছু দর্শন না করে, কাউকেও যেন অমঙ্গলকর কোন অভিজ্ঞতা লাভ না করতে হয়। পৃথিবীর একটি প্রাণীর , একটি পতঙ্গের জীবনেও যেন দুঃখের অভিজ্ঞতা না থাকে। বুদ্ধ থেকে রামকৃষ্ণ পৃথিবীর সকলকে মৈত্রী , করুণা, মুদিতা ও অহিংসার মন্ত্রকে জীবনের অঙ্গ করতে উপদেশ দিয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষে শিকাগোর ধর্মমহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের এই সনাতন আকুতি ও আকান্দাকে এবং তাঁর গুরু শ্রীরামকৃষ্ণের উপলব্ধিকে প্রাণস্পর্শিভাবে বাঙ্ময় করে তুলেছিলেন। যদিও স্বামীজীর সেই উচ্চারণ বহুশ্রুত ও বহু–পরিচিত, তবুও বর্তমান প্রসঙ্গে পুনরায় তা স্মরণ করা প্রয়োজন। স্বামীজী বলেছিলেন, ধর্মের নামে, সম্প্রদায়ের নামে, রাজনীতির নামে, সংস্কৃতির নামে পৃথিবী বারবার মানুষের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে। মানুষের লোভ, মানুষের আগ্রাসন, মানুষের অসহিষ্ণুতা, মানুষের স্বার্থপরতা পৃথিবীর বাসযোগ্যতাকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে। সভ্যতাকে নিশ্চিহ্ন করেছে। মানুষের মধ্যে হতাশার কালো মেঘ পুঞ্জীভূত করে দিয়েছে। স্বামীজী বলিষ্ঠ ভাষায় বলেছিলেন –

অবসান হোক সকলপ্রকার আগ্রাসনের , শোষণের, সকলপ্রকার অসহিষ্ণুতার, সকলপ্রকার দুরভিসন্ধি ও অপপ্রয়াসের। তা তরবারির মুখেই আসুক অথবা লেখনীর মাধ্যমেই প্রকাশিত হোক। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছিলেন , যদি কেউ মনে করে থাকে যে, শুধু সে-ই সমৃদ্ধির মদিরা পান করার জন্য বেঁচে থাকবে এবং অন্যেরা নিক্ষিপ্ত হবে অবলুপ্তির অন্ধকারে , সে নির্বোধ ভিন্ন আর কিছু নয়। একটির অভ্যুদয় এবং অপরগুলির বিনাশের দ্বারা নিজের সমৃদ্ধির চিন্তা নিতান্তই দুরাশা। তা কখনো হয় না, হয়নি, হতে পারে না। শিকাগোর বিশ্বমঞ্চে স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর শেষ বাণীতে উচ্চারণ করেছিলেন নতুন পৃথিবীর প্রগতির প্রণবমন্ত্র : ''বিবাদ নয়, সহায়তা বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।''

একবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে দাঁড়িয়ে আমরা তাই কোন হতাশাকে স্থান দিতে প্রস্তুত নই। আমরা বিশ্বাস করি, বৃহৎ শক্তিবর্গ তাদের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করবে এবং তাদের সদিচ্ছা ও সক্রিয় সহযোগিতায় দারিদ্র্য , সন্ত্রাস, সাম্প্রদায়িকতা, অসাম্য ও হিংসা-মুক্ত এক পৃথিবীকে আমাদের উপহার দেবে। বিশ্ব -সংগঠন রাষ্ট্রপুঞ্জ হয়ে উঠবে সেই প্রক্রিয়ার মূল নিয়ামক এবং প্রধান স্থপতি। প্রতিশ্রুতি ও প্রত্যাশার ফুলঝুরি ফুটিয়ে নয় , পরস্পরকে দোষারোপের বন্যা বইয়ে নয় , নতুন পৃথিবীর আবির্ভাবকে বাস্তব করতে হবে অঙ্গীকাররক্ষার নিশ্ছিদ্র সাধনায়। ভারতের প্রতিবেশী রাষ্ট্রকে আমেরিকা , ফ্রান্স ও চীনের সমর-সরঞ্জাম সরবরাহ এবং আমেরিকা , চীন, জার্মানী ও ফ্রান্সের বারবার পারমাণবিক বিস্ফোরণে রাষ্ট্রপুঞ্জের ভবিষ্যৎকে একটি প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ তারপর ঘটিয়ে চলেছে আমেরিকা এবং চীন। অবশ্য ভারত ও পাকিস্তানও ঘটিয়েছে। কিন্তু তার জন্য যে সমালোচনা বর্ষিত হয়েছে ভারত এবং পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে তা তুলনাহীন। বিশেষত ভারতের উদ্দেশ্যে। সমালোচনা করেছে আমেরিকা, চীন, ফ্রান্স প্রমুখ বৃহৎ শক্তিগুলিই, যারা নিজেরাই বারবার ঐ অপকর্ম করে চলেছে। রাষ্ট্রপুঞ্জ অসহায়। তার কথা কেউ শোনেনি এবং শোনে না। ইরাকের ওপর আমেরিকা ও ব্রিটেনের সদম্ভ আগ্রাসনের সময় রাষ্ট্রপুঞ্জের নখদন্তহীনতা পুনরায় প্রমাণিত। তার পরেও বিশ্বের দুর্বলতর রাষ্ট্রগুলির ওপর আগ্রাসন ও শোষণ নেমে এসেছে। তুরস্ক , সিরিয়া প্রভৃতিতে যে বোমা বিস্ফোরণ চলেছে তা তো সভ্যতার লজ্জা। নিরীহ , নিরস্ত্র, অসহায় মানুষ নরনারীশিশু নির্বিশেষে এই দুষ্কর্ম নির্বিচারে চলছে। তবু আমরা আশাবাদী। রাত্রি যতই দীর্ঘ হোক , তার অবসান হবেই। সেই আশা ও আকান্দায় আমরা প্রতীক্ষা করব নতুন ঊষার পদধ্বনির ।